খোশগল্প

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা অনেক সময় ঘটে, যা লিখিতে বসিলে যেন গল্পের মত শোনায়।

আমার জীবনে এমনি ধরনের ঘটনা একটি ঘটিয়াছিল, ঘটিয়াছিলই বা কি করিয়া বলি— ঘটিয়াছে বলাই সঙ্গত, কারণ তাহার জের এখনও চলিতেছে। যদিও বাহিরের দিক হইতে তাহার জের কিছুই নাই, যা কিছু ঘটিতেছে সবই আমার ও আর একজনের মনে।

প্রেমের কাহিনী এ নয়, কিসের কাহিনী বলা শক্ত। এত সূক্ষ্ম ও বস্তুবিহীন তার ঘটনা, যেন মাকড়সার জালে বোনা কাপড়—জোর করা চলে না তার উপর—একটু বেশি বা একটু কম কথা বলিলেই ঘটনার সূক্ষ্ম রহস্যটুকু একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই খুব সতর্কতার সহিত ব্যাপারটা বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

আর ভূমিকা করিব না, এখন গল্পটা বলি।

প্রথমেই আমার একটু পরিচয় দিয়া লই। যাঁহারা এ গল্প পড়িবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ, একটা লাইনও যেন বাদ দিবেন না—মনে রাখিবেন, এর প্রতি লাইনের প্রয়োজনীয়তা আছে, গল্পটিকে সম্যক বুঝিতে হইলে।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেন কি বৃত্তান্ত সে-সব গল্পের পক্ষে অবান্তর। সুতরাং সে-কথার দরকার নাই।

বিবাহ করি নাই বলিয়া ভবঘুরেও ছিলাম না।

ছোট একটি ব্যবসা ছিল। তাহা হইতে দু-পয়সা রোজগারও হইত। এমন সে ব্যবসা আরও বাড়িয়াছে। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশে ঘুরিতে হইত, এখনও হয়। কলিকাতায় বাড়ি এখনও করি নাই তবে হিতাকাঙক্ষী বন্ধুবান্ধবগণ যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে বাড়ি না করিলে আর চলে না—চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্তত করিতে হইবে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে সুবিধামত জমি দেখিতেছি। এই হইতেই আমার মোটামুটি পরিচয় আপনারা পাইলেন।

বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনে নামিয়া উত্তর দিকে বাঁধানো সড়ক ধরিয়া সাত-আট মাইল গরুরগাড়ি করিয়া গেলে দিয়াখালি বলিয়া একটি গ্রাম পড়ে। এখানে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি।

এই অঞ্চলে ব্যবসা উপলক্ষে মাঝে মাঝে যাইতাম। অর্থাৎ আখের গুড় কিনিতে বনপাশ হইতে ছ-মাইল দূরবর্তী জগন্নাথপুরের হাটে আমাকে মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রতি-বৎসর যাইতে হইত।

যখনই গিয়াছি দিয়াখালি গ্রামে, আমার সেই সহপাঠীর বাড়িতে গিয়া একবার করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। কলিকাতায় কলেজে একসঙ্গে বি. এ. পড়িয়াছিলাম, আমার সে বন্ধুটি বি. এ. পাস করিতে পারে নাই, গ্রামেরই মাইনর স্কুলে অনেকদিন হইতেই সে হেডমাস্টারি করিতেছে।

আমার বন্ধুর স্ত্রী পল্লীগ্রামের বধূ যদিও, আমার সামনে বাহির হইয়া থাকেন তো বটেই, আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পরিবারেই একজনের মত।

মেয়েমানুষের যেমন স্বভাব, যখনই যাই, আমার বন্ধুপত্নী আমায় বাঁধা নিয়মে অনুযোগ করিতেন, আমি কেন বিবাহ করিতেছি না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম যতবার সেখানে গিয়াছি কখনও ঘটিতে দেখি নাই।

—শুনুন, এবার একটি বড়সড় দেখে, এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলুন। না— শুনুন আমার কথা—এর পরে কে দেখবে শুনবে, সেটাও তো ভাবতে হবে! বিয়ে করে ফেলুন।

এ ধরনের কথা শুধু আমার বন্ধুপত্নীর মুখ হইতে যদি শুনিতাম, হয়তো আমার মনে একটা কিছু রেখাপাত করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু আমি তো এক দিয়াখালি গ্রামেই ঘুরি না—সারা বাংলা দেশের কত জেলায়, কত গ্রামে, কত শহরে কার্যোপলক্ষে ঘুরিতে হয় এবং প্রায় অনেক স্থানেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের মুখ হইতে ঐ একই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম।

আমার মাসীমা, পিসীমা এবং অন্যান্য আত্মীয়া-কুটুম্বিনী সমস্ত এ-বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—ঘরে-বাহিরে এভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় জিনিসটা আমার যথেষ্ট গা-সহা-গোছের হইয়া পড়ার দরুন কোনো প্রস্তাবই তেমন গায়েও মাখিতামবা নূতন কিছু বলিয়া ভাবিতাম না।

একবার দিয়াখালি গিয়াছি মাঘ মাসে, আমার বন্ধুপত্নী সেবার যে-কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রীতিমত কৌতুক অনুভব করিলাম।

বলিলেন—আমি কিন্তু এক জায়গায় আপনার বিয়ে ঠিক করে রেখেছি।

একটু কৌতুক করিয়াই বলিলাম—কি রকম?

—আজ প্রায় ছ-সাত মাস আগে আমাদের এখানে শিবতলায় বারোয়ারি শুনতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—তার দিদিমার সঙ্গে গরুর গাড়ি করে পাশের গাঁ বারোদীঘি থেকে যাত্রা শুনতে এসেছিল। বেশ মেয়েটি, চমৎকার গড়নপিটন, লম্বা একহারা চেহারা। কেবল রংটি ফর্সা নয়—কালো। খুব কালো না হলেও কালোই মোটের উপর। নামটা ভুলে গেছি—খুব সম্ভব মণিমালা।

উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—বেশ, তারপর ?

—আমি তাকে বললুম আপনার কথা। আপনি কি করেন, কোথায় বাড়ি—সব বলবার পরে তাকে বললুম, এঁর সঙ্গে কিন্তু তোমার ভাই বিয়ের ঠিক করেছি।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। অবাক হইয়া বলিলাম—কি করে বললেন? জানা নেই, শোনা নেই, বললেন অমনি বিয়ের কথা!

বন্ধুপত্নী পাড়াগাঁয়ের সহজ সারল্যের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুনই বোধ হয় এই অদ্ভুতআচরণের অদ্ভুতত্ব একেবারেই ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন—কেন বলব না? আমার চেয়ে বয়সে যদিও ছোট, তবুওতার সঙ্গে সমবয়সীর মত ভাব হয়ে গেছল। বললুম, ওঁর একজন বন্ধু আছেন, তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসেন—আমি তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের চেষ্টা করছি। এখন তুমি যদি মত দাও ভাই, তবে আমি ওঁর কাছে কথা পাড়ি।

—মেয়েটি কি বললে? মত দিলে?

—বললে, তিনি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন? আমি বললুম, খেয়ালী লোক তাই। এবার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে, তা ছাড়া তোমার মত মেয়ে পেলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। তার পরে মেয়েটি আপনার সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করলে। আপনার বয়েস কত, মুখুজ্যে না চাটুজ্যে—কি পাস? কি পাস, এই কথাটা দু'বার করে জিজ্ঞেস করলে—যখন বললুম বি. এ. পাস—সে তা তো আবার বোঝে না।বললুম—তিনটে পাস। তখন তার মুখ দেখে মনে হল বেশ খুশীই হয়েছে। সুতরাং ও-পক্ষের মত আছে বোঝা গিয়েছে। এখন আপনি মত করে ফেলুন তো ঠাকুরপো! আমি সব ঠিক করি। বাপের নাম-ঠিকানা আমি জেনে নিইছি, ওঁকে দিয়ে চিঠি লেখাই—কেমন তো?

কোনো মতে সেবারের মত কথাটা চাপা দিয়া তো কলিকাতা ফিরিলাম। তাহার পর বছরখানেক আমার সেখানে আর যাইবার দরকার হয় নাই। পুনরায় সেখানে গেলাম পরের বৎসর মাঘ মাসে।

সন্ধ্যায় বসিয়া গল্প করিতেছি, বন্ধুপত্নী বলিলেন কথায় কথায়—ঠাকুরপো, মনে আছে। সেই মণিমালার কথা? এবারও যে শিবতলার বারোয়ারির দিন তার সঙ্গে দেখা হল!

বলিলাম—বেশ কথা।

তিনি বললেন—তার বিয়ে এখনও হয় নি। গরির ঘরের মেয়ে, বাপ থেকেও নেই, কে বিয়ে দিচ্ছে? ঐ দিদিমা ভরসা। ক-জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিল, টাকার বহর শুনে এরা পিছিয়েছে। তার উপর মেয়েটি অন্য দিকে

যদিও খুব সুশ্রী, কিন্তু রং তো তেমন ফর্সা নয়। আমি কিন্তু আবার তুলেছিলাম আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা। আহা করুন না ঠাকুরপো, গরিবের মেয়ের দায় উদ্ধার ? এবার সে নিজেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি রকম?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে কিনা। আমরা যেখানে বসি সেখানটাতে বসে কথা বললে কারও কানে যাবার ভয় নেই।

পরে একটু থামিয়া হাসিমুখে একটু সুর নামাইয়া বলিলেন—এ-কথা সে-কথার পরে আপনার কথা তুললাম—তা বললে, বি.এ. পাস তো চাকরি না করে ব্যবসা করেন কেন? আমি বললাম—স্বাধীন ব্যবসা ভালবাসেন, টাকাও বেশ রোজগার করেন। আর একটা কথা বলেছে, শুনলে আপনি হাসবেন।

—কি কথা?

—বললে, আপনি দেখতে কেমন; কালো না ফর্সা।

কৌতুকের সুরে বলিলাম—আপনি কি বললেন?

—বললাম, না কালো, না ফর্সা, মাঝামাঝি।

—এঃ, আপনি আমার বিয়ের চান্সটা এভাবে মাটি করে দিলেন?

বন্ধুপত্নী কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি আছে? না, ও হবে না । এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে করুন—সব ঠিক করে ফেলি।

এ ধরনের কথা খোশগল্প হিসাবেই শুনিয়া থাকি, এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি এ ধরনের কথায়। কাজেই যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম, তখন বেমালুম সকল কথাই মনের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল কাজের হুড়াহুড়িতে।

বছর পার হইতেই জীবন অন্য পথে চলিল।

পূর্বের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসা খুলিলাম কলিকাতায়। সুতরাং জগন্নাথপুরের হাটে গুড় কিনিতে আর যাই না। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিবাহও করিলাম। মেয়েটি পাইয়াছি ভালই, ভবানীপুর অঞ্চলে বাপের-বাড়ি, লেখাপড়া জানে, সুন্দরীও বটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ—চমৎকার গান গায়।

বিবাহের পরও দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। গত মাঘ মাসের কথা, এক দিন ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ি হইতেই ফিরিতেছি। বৈকাল গড়াইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, ফোর্টের বেতারের মাস্তুলে লাল আলো জ্বলিয়াছে। বৈদ্যুতিক সংবাদপত্রের উজ্জ্বল অক্ষরে জানাইয়া দিল যে আবিসিনিয়ার সম্রাট লীগ অব নেশন্সে পুনরায় দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন এবং মোহনবাগান হকি না ক্রিকেট খেলিতে বোম্বে যাইতেছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে বাস হইতে নামিতেই নজরে পড়িল, আমার সেই দিয়াখালির বন্ধুটি সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সম্ভবত বাসের প্রত্যাশায়। খুশীর সহিত আগাইয়া গেলাম।

—আরে, তুমি কলকাতায় যে! কবে এলে? এই যে নমস্কার, ভাল আছেন? অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি—চিনতে পারেন?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—চিনতে কেন পারব না? আপনি ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন তার পর থেকে! আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

বন্ধুপত্নীকে মিষ্ট কথায় ঠাণ্ডা করিলাম। বন্ধুটির মুখে শুনিলাম তাহার ছোট শালী চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে আজ দিন পনেরো হইল—মনের অবস্থা খারাপ হওয়াতে পত্র পাইয়া বন্ধুটি সস্ত্রীক শালীকে দেখিতে আসিয়া শ্যামবাজারে এক আত্মীয়বাড়ি উঠিয়াছে। এখন চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন হইতেই ফিরিতেছে। মেট্রোয় বায়োস্কোপ দেখিবে বলিয়া এখানে নামিয়া পড়িয়াছে।

বন্ধু বলিল—চল না হে, তুমিও চল। এ তো কখনো ওসব দেখতে পায় না, তাই ভাবলাম ফিরবার পথে মেট্রোতে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যাব।আর এদিকে শালীটি তো সেরে উঠেছে, কাজেই মনও ভাল। এস আমাদের সঙ্গে।

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গেলাম মেট্রোতে। কয় বছর যাই নাই, বন্ধু ও বন্ধুপত্নী সেজন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন। কথায় কথায় বন্ধুপত্নী বলিলেন বিয়ে করেছেন আপনি?

কথার কি উত্তর দিব ভাবিতে-না-ভাবিতেই তিনি বলিলেন করেন নি তা বেশ বুঝতে পারছি। উনিও বলেন, সে বিয়ে করলে কি আর আমাদের একখানা নেমন্তন্ন-পত্রও দিত!...করেন নি—না?

এ-কথার পরে বিবাহ করিয়াছি কথাটা হঠাৎ বলা চলে না।সুতরাং তখনকার মত অর্থবিহীন হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তবে হাসিটি যতদূর সম্ভব দ্ব্যর্থসূচক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মনে আছে।

ইন্টারভ্যাল হইল। বন্ধুটি পান কিনিবার জন্য বাহিরে গেল।

আমার বিবাহের কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, ভাবিলাম এইবার মোলায়েম করিয়া বলিয়া ফেলি বন্ধুপত্নীর নিকট।

কিন্তু বন্ধুপত্নীও যে আর একটা কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা বুঝি নাই। বলিলেন—জানেন, একটা কথা বলি—সেই যে আমাদের দেশের মেয়েটির কথা বলেছিলুম, মনে আছে? সেই মণিমালা?

—হ্যাঁ, খুব আছে।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

—এই গত পৌষ মাসে শিবতলায় আমার তার সঙ্গে দেখা। দু-বছর দেখা হয় নি, কথাআর ফুরুতে চায় না। তার বিয়ে হয় নি এখনও। কেন হয়নি সেকথা আমি জিজ্ঞেস করি নি, তবে ভাবে বোঝা তো যাচ্ছে, ও-রকম গরিব ঘরের মেয়ের কেন বিয়ে হতে দেরি হয়।

আমি কথা বলিবার জন্যই বলিলাম—হ্যাঁ, তা বইকি।

—তারপর শুনুন, কথায় কথায় কলকাতার কথা উঠল। সে কখনও কলকাতা দেখে নি। আমি হেসে বললুম—আচ্ছা, তোমায় শীগ্‌গির কলকাতা দেখাচ্ছি। এ-কথায় মেয়েটি হাসলে। ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও বুঝতে পেরেছে আমি কি বলছি। একটু পরে নিজেই বললে—আপনাদের বাড়িতে সেই যে ভদ্রলোক আসতেন, তিনি আর আসেন না? আমি বললাম—অনেক দিন আসেন নি, তার পর হেসে বললাম—তবে একটা কথা জানি, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাহলে একখানা অন্তত নেমন্তন্নের চিঠি তো আমরা পেতাম নিশ্চয়ই। মেয়েটি হেসে চুপ করে রইল। আমার বেশ মনে হয় যে এখনও মনে মনে ভাবে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। তার উপর আবার শুনুন, হয়তো আমার উচিত হয় নি এত কথা বলা—আসবার সময় আবার তাকে বললাম—তাহলে কিন্তু এবার কলকাতা দেখার ব্যবস্থা করছি। মেয়েটির লজ্জা হল কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ভারী খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মুখে কেবল একটা কথা বলেছিল উঠে আসবার সময়। যেন তাচ্ছিল্যের সুরে হঠাৎ বললে—আমার আর অমত কি, তবে তুমি ভাই দিদিমাকে একবার বলো।সত্যই সে আপনার আশায় আশায় রয়েছে, এ আমি জোর করে বলতে পারি। যা বলেছে, মেয়েমানুষ তার চেয়ে আর কি বেশী বলবে? এ দোষ আমারই, সেজন্যে ওঁর সামনে বললাম না। উনি শুনলে রাগ করবেন। আমার অনুরোধ ঠাকুরপো, দয়া করে গরিব-ঘরের মেয়েটাকে নিয়ে তাদের দায় উদ্ধার করুন। আপনি তাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবেন, একথা বলতে পারি। অমন সুশ্রী, সরলা, শান্ত মেয়ে পাবেন না—হলই বা গরিব!

আমার বন্ধু পান কিনিয়া ফিরিয়া আসাতে কথাটা চাপা পড়িল।

অতঃপর আর আমার বিবাহের কথা ইহাদের নিকট বলিতে পারিলাম না। হয়তো একটু গর্ব করিয়াই বলিতাম আমার স্ত্রী সত্যই সুন্দরী, এমন কি ইহাও ভাবিতেছিলাম, একদিন উভয়কে বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া

লইয়া গিয়া স্ত্রীর গান শুনাইয়া দিব—কিন্তু বন্ধুপত্নীর সহিত কথাবার্তার পরে আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল।

কেন যে এমন সব ধরনের ব্যাপার ঘটে!

কোথায় কাহাকে কে খোশগল্পের ছলে কি বলিল, তাহাই শুনিয়া একটি সরলা পল্লীবালিকা মনে কি জানি সব স্বপ্নজাল বুনিতেছে এখনও, অথচ যাহাকে ঘিরিয়া এ স্বপ্ন রচনা—এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, সে দিব্য আরামে চাল দিয়া কলিকাতায় বেড়াইতেছে, বিয়ে-থাওয়া করিয়া নববধূকে লইয়া মশগুল হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতেছে।

সেই হইতে এই কয়মাস সুদূর রাঢ় অঞ্চলের একটি অদেখা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কথা আমি ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি।